4

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাসের জন্য

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবই এখন সন্ত্রাসকবলিত। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের কারণে সবচেয়ে বেশি সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। এগুলো ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও মাঝে মাঝে সন্ত্রাসকবলিত হয়, বাদ যায় না অন্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোও। শিক্ষাঙ্গনের এই সন্ত্রাস নিয়ে সমাজের সচেতন স্তরে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি বা হচ্ছে না, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কার্যকর কোন ফর্মূলা এখনও কেউ বের করে উঠতে পারেননি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও মাঝে মাঝে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে সন্ত্রাস সাময়িকভাবে কিছুটা কমলেও একেবারে থামে না, আবার ক'দিনের মধ্যেই দেখা যায় নতুন রূপে ফিরে এসেছে সন্ত্রাস। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসের উৎস ও চরিত্র ভিন্ন। তাই একই প্রক্রিয়ায় সব শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধ হবে না, এটা সবাই বুঝে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সন্ত্রাস হয় তার চরিত্রেরও ভিন্নতা রয়েছে। অন্য দু'টি বড় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তাণ্ডব ঘটে না, তবে অন্য রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনসমূহ এখানে বেশ সংহত অবস্থায় আছে এবং তারা তুমুল তাণ্ডব ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। এখানে সন্ত্রাসের উৎস নানা রকম, রাজনৈতিক বিভেদ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে চাঁদাবাজি, টেন্ডার নিয়ে দ্বন্দ্ব, হল দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা। শিক্ষা সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে সন্ত্রাস তেমন হয় না; এর কারণ সম্ভবত এই যে, সন্ত্রাসীদের বেশিরভাগই বহিরাগত, রাজনৈতিক মদদপুষ্ট হয়ে তারা বিভিন্ন হলে অবস্থান করে।

সন্ত্রাস এমনিতে হয় না, এর জন্য চাই অস্ত্রশস্ত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসে এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে হাতবোমা, এবং অন্যান্য ধারাল অস্ত্র যেমন কুড়াল, চাপাতি, রামদা ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এসব অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে, এবং বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আস্তানাও এসব হলেই। তারাও তরুণ, সাধারণ ছাত্রদের মতো বয়সী বলে সহজে এদেরকে শনাক্ত করা যায় না কিন্তু যে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে এরা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীর ভূমিকা নেয়।

ইতোপূর্বে বেশ ক'বার পুলিশ হলে হলে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসী বহিষ্কারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র যেমন খুব বেশি একটা উদ্ধার হয়নি তেমনি বহিরাগত সন্ত্রাসীদেরও স্থায়ীভাবে হলের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করা যায়নি। কয়েক বার পুলিশ প্রহরা এবং পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে ঢোকার বিধিবিধান করেও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আগমন রোধ করা যায়নি। সাময়িকভাবে কিছুদিন বহিরাগতদের আনাগোনা কম থাকলেও সময় যত গড়িয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি আবার আগের মতোই হয়ে উঠেছে।

গত পয়লা জুন থেকে বেশ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সন্ত্রাস নির্মূল ও বহিরাগত অছাত্র সন্ত্রাসী বিতাড়নের লক্ষ্যে প্রতিটি আবাসিক হলের গেটে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পুলিশকে এবং তাদের সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছিল। ছাত্র- শিক্ষক-কর্মকর্তারাও এই ব্যবস্থাকে কার্যকর মনে করেই পুলিশের হলগেটে অবস্থান ও পরিচয়পত্র পরীক্ষার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিল। এই মানসিকতায় ছিল অভিনবত্ব, কারণ ইতোপূর্বে সব সময়ই দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশকে সহ্য করেনি কেউই। এক সময় হল তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেও পুলিশ প্রহরা ছিল অচিন্তনীয়। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মেনে নিয়েছিলেন এই ব্যবস্থাকে। কিন্তু এই নিয়ম করেও তেমন ফল হয়নি। সন্ত্রাসীদের আনাগোনা কিছুটা কমলেও একেবারে বন্ধ হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসী তাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজছে বলে ২৩ জুন জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে। নতুন সম্ভাব্য উপায় হিসাবে ল্যামিনেটিং করা পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপাচার্য জানিয়েছেন, তিনি নিজে কয়েকদিন রাতে বিভিন্ন হল পরিদর্শন করে দেখেছেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছেন মস্তানদের উৎপাত কমেছে। তিনি সন্ত্রাস নির্মূলে যারপরনাই চেষ্টা করছেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করছেন।

কিন্তু ল্যামিনেটিং করা পরিচয়পত্রের বিষয়টি নিয়েও সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। প্রথমত এতে খরচের একটা ব্যাপার আছে। প্রকাশিত সংবাদ মারফত জানা গেছে, সব ছাত্রছাত্রীর কার্ড তৈরি করতে ৩ থেকে ৪ লাখ অথবা ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা খরচ হবে। পরিচয়পত্র ল্যামিনেটিংয়ের টেন্ডার নিয়েও তাই সন্ত্রাস হতে পারে। তাছাড়া বহিরাগত মস্তানরা ল্যামিনেটিং করা জাল পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারবে না এমন নিশ্চয়তা কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন? দুর্নীতির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো পরিচয়পত্র বেহাত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে পুলিশ তো হলগেটে পরীক্ষা করে কিছুই বুঝতে পারবে না।

আসলে পুলিশী প্রহরা ও পর্যবেক্ষণ কিংবা ল্যামিনেটিং করা পরিচয়পত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নির্মূলে স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দেশের বড় ছোট রাজনৈতিক দল, যেগুলোর অঙ্গসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি করছে, তারা তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করবে কিনা তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা হবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকরা কার্যকরভাবে ছাত্র রাজনীতিকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসীমুক্ত করতে চান কিনা? এই বিষয়গুলো নিশ্চিত হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও সন্ত্রাসমুক্ত হবে, পুলিশও লাগবে না, ল্যামিনেটিং করা পরিচয়পত্রও লাগবে না।